Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.88-93
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সতীদাহ প্রথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহামায়া গল্পের আলোকে ফিরে দেখা

পরিতোষ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, গলসী, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Indian society is multi diversity. There are so many races, culture, clan and religion. All groups are distinguished from each and others. Hindu are the majority people in the country. Hindu community's many traditional practices are much critisied in the colonial period. Sateedah system is the one of them. Satee means that Hindu women never attempt to extra martial affairs. They always should be devoted life only to the husband. Now come to the point that when someone's husband had been died then the widow women burning death with her husband that is called Sateedah system. This is a brutal ritual in the community.

In this research paper I would like to revisit the ritual of Sateedah system through Rabindranath Tagore short story Mahamaya that story was published on Bengali 1326 in Bhadra month. Also try to discuss that the values of story character context in that period. Actually want revisiting to the past to searching the origin of Sattedah system and its historical essence. Rammohan Ray was a prominent leader to stop the brutal tradition. The short story Mahamaya raised many questions against social system and custom and also the perspective of the caste system and so on. In this story Rabindranath Tagore had written historical context that was great massage from him to our society.

Keywords- Satee, Mahamaya, Rabindranath Tagore, Ram Mohan Ray, Koulinya Pratha

'সতী' শব্দটি ভারতীয় সনাতন সমাজে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'সতী' শব্দটির উৎপত্তি 'সৎ' শব্দ থেকে অর্থাৎ যে নারী স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত নয়[i] । আসলে পুরুষপ্রধান সমাজ নারীদেরকে সম্পদের থেকে বেশি কিছু ভাবেনি। কখনো নারীকে ভাবা হয়েছে কামনার দাসী, কখনও মিথ্যার অবতার বলা হয়েছে। পুরুষদের সতর্ক করে বলা হয়েছে যদি ভাল কিছু চাও তাহলে মেয়েদেরকে সহমরণে নিয়ে যাও। তবেই সমাজে কোন অঘটন কিছু ঘটবে না। প্রাচীন ভারতে মনুস্মৃতিতে নারীকে দাসী বা শূদ্রের সাথে তুলনা করেছে। নারীকে অকৃতজ্ঞ, নারীকে বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি নানান রূপে অবহিত করা হয়েছে। নারী জাতি সম্পর্কে মানুষের ধারনা কিরূপ ছিল তা রাজা রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' এর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, যেমন –'স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরুপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ …….. যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়[i i] । ……. সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভবনা", ……. উল্লেখ্য যে রাজা রামমোহন রায় সমাজের এইরূপ মানসিকতা যে কতটা ভুল ছিল তা তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ও

যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য রামমোহনের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

সতীদাহ প্রথা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা গেছে বলেই বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনে করেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে ভারতের ইতিহাসে সতীর কথা জানা যায়। সতীদাহ প্রথার উল্লেখ করেছেন গ্রিক ঐতিহাসিকরা, পাশাপাশি রোমান লেখায়ও উল্লেখ পাওয়া যায়। সতীদাহ প্রথা মেগাস্থিনিসের লেখাতেও পাওয়া যায়। আসলে মেয়েদের অত্যাচার স্থান, কাল, পাত্র ভেদে অভিন্ন ছিল। কখনও সতী কখনও ডাইনি বিভিন্ন নামে মেয়েদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে। ভারতবর্ষে তৃতীয় শতাব্দীতে সতীর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। ৫১০ খ্রিস্টাব্দে এরণ শিলালিপিতে সতী প্রথার উল্লেখ রয়েছে[iii]। একথা বলা যায় যে সতী প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে এবং সতী প্রথার রেশ কখনো বেড়েছে বা কমেছে।

সতী প্রথার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল! সে প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। পণ্ডিতদের একটি গোষ্ঠী মনে করেন নারীরা বিশ্বাসঘাতক অপর গোষ্ঠীটি পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভরসা করছেন। পুরাণে দক্ষরাজার কন্যা সতীর (মহামায়ার) দেহত্যাগের ঘটনা তুলে ধরেন। বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ভারতীয় নারীরা অনেক সময় স্বামীকে বিষ প্রয়োগে করে হত্যা করত। সেই জন্য বলা হতো স্বামী মারা গেলে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে সতী করা হবে। তাই নিজের জীবন ও স্বামীর জীবনকে সমার্থক করে দেওয়ার জন্যই সতীদাহ প্রথার উৎপত্তি হয় বলে দাবি করা হয়। সতীদাহ প্রথার দুটি ভাগের কথা জানা যায় যথা- সহমরণ ও অনুমরণ। স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় পুড়ে সতী হওয়াকে সহমরণ। অপরদিকে কোন কারণে স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় সতী হতে না পারলে, দূরে কোথাও স্বামীর কোন স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে সতী হওয়াকে অনুমরণ বলা হয়[iv]।

গবেষণা পত্রে সতীদাহ প্রথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'মহামায়া'র প্রেক্ষিতে আলোচিত হবে। তৎকালীন নিষ্ঠুর অমানবিক ঘৃণিত সতীদাহ প্রথার রূপ তুলে ধরা হবে। গল্পের মহামায়া নামকরণের ব্যাখা হল- "**মহামায়া** হল হিন্দু দর্শনে বর্ণিত পরমেশ্বরী শক্তি। নাগোজীভট্টী টীকা অনুসারে- মহামায়া বিসদৃশ-প্রতীতি সাধিকা ঈশ্বরশক্তি। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা মতে মহামায়াই হল- অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। ঈশ্বর সৃষ্টি, পালন, সংহার ও জন্ম লীলা প্রভৃতি কার্য এই মহাশক্তির সাহায্যেই সম্পাদন করেন বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। এই মহাশক্তিই দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামে ও রূপে ভক্তদের দ্বারা পূজিতা হন। ইনি শিবকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেন। ইনি দক্ষ কন্যা সতী ও হিমালয়ের কন্যা পার্বতী রূপে জন্ম নেন"[v]।

মহামায়া গল্পটি মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে মহামায়া ও রাজীব উভয়ের দুপুরবেলা নদীর ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে দেখা করছে। যেখানে রাজীব বাল্যবন্ধু মহামায়াকে ডেকে এনেছে মন্দির তলে বর্তমানে উভয়ই যুবক-যুবতী। দেখা করার কারণ, রাজীবের যে রেশম সাহেবের নিকট কাজ করত তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যাবে। ফলে রাজীবকে সাহেবর সঙ্গে চলে যেতে হবে। অন্যদিকে রাজীব মাহামায়াকে জীবনসঙ্গী রূপে নিয়ে যেতে চাইছে। সেই ভালবাসার কথা বলার জন্যই রাজীব দুপুরবেলা নদীর ধারে মন্দির তলে তাকে ডেকে এনেছে।

রাজীবের সেই ভালবাসার প্রস্তাব কিভাবে দিচ্ছেন, তা রাজীবের নিজের কথায় তুলে ধরছি, যথা- "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখানে হইতে পালাইয়া গিয়ে আমরা দুজনে বিবাহ করি"। প্রথম পরিচ্ছেদের

শেষে রাজীবের বিয়ের প্রস্তাব কার্যত মাথা নাড়িয়া মহামায়া জবাব দিল "না, সে হইতে পারে না"। রাজীব সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, রাজীব অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে পিসির নিকট মানুষ হয়েছিল। রাজীবের বাবা যে সাহেবের নিকট কাজ করত সেই সাহেবই রাজীবকেও তার কাছেই কাজে নিয়েছিলেন। কাজের সূত্রে রাজীব পিসিমনির সঙ্গে মহামায়াদের বাড়ির পাশেই ভাড়া বাড়িতে থাকত। প্রথম পরিচ্ছেদ গল্পকার মহামায়ার রূপ সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল, 'মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা-- সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক'। এভাবেই বর্ণনা করেছেন মহামায়ার রূপ-যৌবনকে। গল্পকার মহামায়ার জাত সম্পর্কে বলছেন যে তাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং মহামায়দের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ যার জন্য কোন ভালো পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে পারছেন না তাঁর দাদা। পরিচ্ছেদের শেষ দিকে মহামায়ার দাদা ভবানীচরণকে মন্দির প্রাঙ্গনের দিকে আসতে দেখে রাজীব ভয় পেয়েছিল। যদিও গল্পে ভবানী চরণের মন্দির প্রাঙ্গনে আসার কারণ স্পষ্ট নয়। মহামায়াকে গল্পকার গম্ভীর ও স্বাধীনচেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। গল্পের একটি চমক বলা যায় যখন মহামায়া বলে, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো"। তারপর সে মন্দির থেকে তাঁর দাদার সঙ্গে বাড়ির দিকে ফিরে যায়। রাজীব হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে কিছুই বুঝতে পারে না, আদবে কি হল এবং মহামায়া ঠিক কি বলতে চাইল। মহামায়া কেন বলেছিল তোমার ঘরে যাবো সেটাও একটা চমক রুপেই ছিল পাঠকের নিকট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শুরুতেই দেখা যায়, যেদিন মন্দির প্রাঙ্গনে রাজীব ও মহামায়া দেখা করেছিল। তারপরে সেই রাত্রেই পূর্ব পরিকল্পনা মত মহামায়ার সঙ্গে এক মৃতপ্রায় বৃদ্ধের বিয়ে দেয়া হয় শ্মশানের গঙ্গাযাত্রী ঘরে। মহামায়া বিয়েতে কোনরূপ আপত্তি জানায়নি, যদিও মেয়েদের কোন আপত্তি শোনাও হত না। মেয়েদেরকে যেমন খুশী ব্যবহার করা হত, তাঁদেরকেই সমাজের কৌলীন্য প্রথা বাঁচিয়ে রাখার দায়ভার বহন করতে হত। বিয়ের পরে প্রত্যাশা মতো তাঁর স্বামী মারা যায়। বিয়ে ও বিধবা হওয়াতে রাজীব যতটা আঘাত পেয়েছিল তার থেকেও বেশি আঘাত পেয়েছিল মহামায়ার সতীদাহের খবর শুনে। রাজীব ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, উতাল পাতাল অবস্থা সে কিছু চিন্তা করতে পারছে না। কিছু ভাবতে পারছে না এমন সময় সন্ধ্যার দিকে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। চারিদিকে ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম। সেই ঝড়ের মধ্যে হটাত করে দমকা হাওয়ার বেগে ঘরের দরজা ঠেলে কোন একজন ঘোমটা দিয়ে প্রবেশ করল। রাজীব কথায় বোঝা গেল অচেনা নারীটি আর কেউ নন তিনি মহামায়া। তাঁদের কথা বার্তায় বোঝা গেল ঝড় বৃষ্টির সুযোগে চিতার আগুন নিভে গেলে মহামায়া সেই সুযোগে পালিয়ে চলে এসেছে। মহামায়া রাজীবের ঘরে ঢুকে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করায়, যে যদি সে কোন দিন ঘোমটা খুলে তাঁর মুখ না দেখে তাহলেই সে রাজীবের বাড়িতে থাকবে। সেই ক্ষণে রাজীব কোন রূপ কথা না বাড়িয়ে সেই প্রতিজ্ঞাতেই হ্যাঁ করে। সমাজের হাত থেকে বাঁচতে দ্রুত তাঁরা সাহেবের নতুন ঠিকানা সোনারপুরের দিকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই যেতে শুরু করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরুতেই গল্পকার পাঠককে বলেছেন, এটা কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। এটি ঐতিহাসিক সহমরণের প্রেক্ষাপটেই রচিত। গল্পের নায়ক নায়িকা হয়ত বাস্তবে নেই কিন্তু গল্পকার বলতে চেয়েছেন সেই সময়ে অহরহ এরকমই ঘটনা ঘটেছে। মহামায়া গল্পের মাধ্যমে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গল্পকার। মহামায়ার চিতা থেকে চলে আসার ঘটনাটি সংক্ষেপে ছিল এরকম, মহামায়ার

হাত পা বেঁধে চিতার আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। চিতার আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল ঠিক তখনই হঠাৎ করে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে শ্মশান যাত্রীরা সকলেই গঙ্গাযাত্রী ঘরে আশ্রয় নেয়। সেই সময় চিতার আগুন নিভে যায়। কিন্তু আগুনে তাঁর হাতের বাধন খুলে গিয়েছিল সে তখন কোন মতে পায়ের বাধন খুলে, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি চলে আসে। সেখানে সে তাঁর রূপ আয়নাতে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে এবং তারপর সে তাঁর শরীরটি অন্য একটি কাপড়ে ঢেকে সোজা রাজীবের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর দুজনে একসঙ্গে এক বিভাজিত দাম্পত্য শুরু করেছিল। অথচ তাঁদের বিচ্ছেদ না হয়েও যেন সমাজ তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়েছিল একখানি কাপড়ের ঘোমটায়। গল্পকার তাঁদের বেদনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কোন এক বর্ষার দিনে রাজীব তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে মহামায়ার ঘরে প্রবেশ করেছিল। রাজীব ঘরে প্রবেশ করে দেখে সে শুয়ে আছে কিন্তু তাঁর বাম গালে পুড়ে যাবার দাগ রয়ে গেছে। এদিকে মহামায়া রাজীবের ঘরে প্রবেশ টের পেয়ে যায়। রাজীব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় সে আশাহত হয়। মহামায়া রাজীবের বাড়ি থেকে কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় চিরদিনের জন্য, এভাবেই গল্প শেষ হয়েছে।

এখানে বেশ কিছু বিষয় নজরে আসে সতীদাহ প্রথা সেটাকে গল্পকার খুব সহজে তুলে ধরেছেন। একজন যুবতী মেয়ে যার রুপ ছিল কাঁচা সোনার মত। সেই রূপ যৌবন আগুনে পুড়িয়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল কৌলীন্য প্রথা বজায় রাখার জন্য। কেবলমাত্র কুলীন প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে একজন মরণাপন্ন বৃদ্ধের সাথে তাঁর বিয়ে দিতে হয়। বিয়ের 24 ঘণ্টার মধ্যেই তার স্বামী মারা যায়। তারপর তাকে সহমরণে যেতে হয়েছিল। সতীদাহের সময় ভাগ্যক্রমে মহামায়া চিতা থেকে বেঁচে ফিরেছেন। ফিরে আসার পর রাজীব ও মহামায়ার সংসার জীবন শুরু হয়। অথচ মহামায়াকে সহমরণের আগে কিন্তু কোন অব্রাহ্মণ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাইনি। বর্তমানে কিন্তু একটি ঘোমটা উভয়েরই মিলনের মধ্যে বাঁধা হয়ে রয়েছে। সমাজ তাকে যেন খানিকটা পুড়িয়ে তাঁর রূপ যৌবনকে নষ্ট করে এবং তাঁর কুলীনত্ব নষ্ট করে দিয়েছিল তাই সে রাজীবের সঙ্গে দাম্পত্য শুরু করতে পেরেছিল। এভাবেই গল্প শেষ হচ্ছে।

মহামায়া গল্পের সতী মহামায়ার তাঁর জাত সম্পর্কে কী বলা হয়েছে! কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের যে রক্ষণশীলতা অর্থাৎ পুরুষ শাসিত সমাজে কৌলিন্যতা বজায় রাখতে গিয়ে মেয়েদেরকে বেশী বয়স্ক স্বামীদের হাতে তুলে দেওয়া হত। দেখা যায় এখানে মাত্র ২৪ বছর বয়সে পরিপূর্ণ যুবতী মহামায়া সম্পর্কে লেখক বলেছন যে তাঁর এখনও বিয়ে হয়নি। অর্থাৎ সে বুড়ি হয়ে গেছে তৎকালীন সমাজের চোখে অথচ বর্তমানে সমাজে ২৪ বছর বয়স মেয়েদের বিয়ের জন্য বেশি নয় কিন্তু তৎকালে ২৪ বছর বয়স মেয়েদের জন্য ছিল বুড়ি হয়ে যাওয়ার সমান। সতীদাহ যে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল লেখক সে কথা বলেছেন। নিজেদের জাতের গৌরব, নিজেদের কৌলিন্য বজায় রাখতে মেয়েদেরকে বেশী বয়স্ক ছেলেদের কাছেও বিয়ে দিতে দ্বিধা করত না। যার ফলে স্বাভাবিক ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের স্বামী মারা যাওয়াটা খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। সামাজিক লোক লজ্জার ভয় ও কৌলীন্যতার বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মেয়েদেরকে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হত। ফলে কৌলীন্যতা বজায় রাখতে গিয়ে বাল্য বিবাহের ঘটনা বাড়ছিল। বিয়ের বিভিন্ন প্রথা, যেমন অনুলোম ও প্রতিলোম। অনুলোম হল যেখানে উচ্চ বর্ণের ছেলের সাথে নিম্ন বর্ণের মেয়ের বিয়ে এবং প্রতিলোম হল নিম্নবর্ণের ছেলের সাথে উচ্চ বর্ণের বিয়ে। বর্তমান সময়েও বিয়ের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে সবর্ণ ও অসবর্ণ উভয়ই বিবাহের নজির দেখা যায়। মহামায়া গল্পের লেখক বলেছেন গল্পের নায়ক রাজীব ও মহামায়ার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর

পরিণতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল তাঁদের ভিন্ন জাত। গল্পের মাধ্যমে উঠে আসে যে এই সম্পর্ক সমাজ মেনে নেবে না। এই বিয়েতে যে সমাজের সম্মতি থাকবে না সে আশঙ্কাও লেখক প্রকাশ করেছেন।

রাজীব ইংরেজ সরকারের অধীনে নীলকুঠিতে সাহেবের কাছে কর্মরত। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়সে সাহেবের ইচ্ছানুসারে নীলকুঠিতে সাহেবের সঙ্গে কাজ করে। এখানে রাজীবের একমাত্র পিসি তাকে বাল্যবিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রাজীব গড়রাজি ছিল। যে কারণেই হোক না কেন কিন্তু রাজিবের অল্প বয়সে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তকে সাহেব প্রশংসা করেছিলেন। এই ঘটনাটি ইংরেজ সাহেবের আধুনিক পাশ্চাত্য সামাজিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন বলা যায়। পাশ্চাত্যে পরিণত বয়সে বিয়ে দেওয়ার যে মানসিকতা সেটা এর দ্বারাই উঠে আসে। উল্টোদিকে দাদার আর্থিক অনটনের কারণে মহামায়ার জন্য কুলীন পরিবারের কোনো পাত্র পাওয়া যায়নি। কুলীন ব্যবস্থায় যে এই সামাজিক সংকট তৈরি করেছিল। বর্ণ ব্যবস্থা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রেখেছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন ইচ্ছা বা সম্মতির কোন গুরুত্ব ছিল না। গল্পে দেখতে পাওয়া যায়, হঠাৎ করে একদিন মহামায়ার দাদা তাঁকে একটি লাল চেলি শাড়ি পড়ে বিয়ের জন্য তৈরি হতে বলছে। কোথায়, কার সঙ্গে বিয়ে সে সম্পর্কে কোন কিছু আগাম জানানো হায়নি মহামায়াকে। মহামায়া সমাজের নিয়মে দাদার অনুগামী হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে। অবশেষে দেখা গেল মৃত্যু শয্যাশায়ী এক বুড়োর সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে কেবলমাত্র কুলীন প্রথা বজায় রাখার জন্য[vi]।

গল্প অনুসারে বিয়ের পরের দিনই তাঁর স্বামী মারা যায় এবং মহামায়াকে সহমরণে দেওয়ার জন্য ধুম পরে যায়। এখানে একটা জিনিস দেখা যায় মহামায়া যে তাঁর বিয়েতে কোন সম্মতি বা তাঁর জীবনের কোন ইচ্ছা ও অনিচ্ছার কোন দাম দেওয়া হয়নি। সমাজে এরকম হাজার হাজার মহামায়ার জীবনের কোন মূল্য থাকত না। মহামায়া এখানে একজন উনিশ শতকের সতী মেয়ের প্রতীক। সমাজের প্রতিটা মেয়েকে এভাবে অত্যাচারিত অবহেলিত হতে হয়েছে। গল্পে যেভাবে তাঁর বিবাহ বংশ মর্যাদা রক্ষার আয়োজন করা হয়েছে তা তৎকালীন ভারতবর্ষে সমাজের প্রতিফলন। যে সমাজ মেয়েদেরকে সম্পদের বেশি কিছু ভাবেনি, নারীদের জীবনের কোন মূল্য দেয়নি। জাতে ওঠার আন্দোলনের জন্য সতীদাহ প্রথা সমাজে ভয়াবহ বিস্তৃত আকার ধারণ করেছিল। ভারতের আধুনিক মানুষ রামমোহনের আন্দোলনের ফলে ১৭ নং রেগুলেশন দ্বারা ১৮২৯ সালে বেন্টিক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন[vii]।

পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্ণের মানুষও সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে জাতে উত্তোলনের চেষ্টা করেছেন। সংস্কারের মাধ্যমে নিজের জাতি সত্তাকে কুলীন প্রথার অনুকরণ করতে চেয়েছেন। ফলে সতীদাহ প্রথা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সতী প্রথার মাধ্যমে নিম্নবর্ণের মানুষও তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি সম্মান বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিল। সতী কারা হতেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আট থেকে আশি বছর বয়সের সমস্ত মহিলারাই। বিভিন্ন পন্ডিতের লেখা থেকে জানা যায় সতী হওয়ার জন্য মেয়েদের মধ্যে লড়াই হয়েছে। যেহেতু কুলীন ব্রাহ্মনের অনেক গুলি স্ত্রী থাকত, তাই কে সতী হবে তা নিয়ে অনেক সময় বিবাদ দেখা যেত। একের বেশি নারী একসঙ্গে সতী হয়েছেন তেমন নজীর আছে। যে পরিবার সতী হত সমাজে তাঁদের ভীষণ রকমের সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেত। তাই অনেক পরিবার এই ঘৃণ্য প্রথা থেকে নিজের পরিবারকে মুক্ত করতে পারেনি। ফলে সমাজের একটা বিশাল মানুষই সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় এই প্রথাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে গেছেন। শুধু কি সমাজ! নিজের পুত্র মা'কে সতী করতে

চেয়েছে। কারণ সতী মায়ের সন্তান হওয়ার গৌরব হেলায় বিসর্জন দিতে চায়নি। তাই সে নিজের মাকেও জোর করে পুড়িয়ে সতী করেছে।

উপসংহার : উনিশ শতকে বাংলায় নারী অধিকার রক্ষার জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর সহ আরও অনেকে আন্দোলন করেছেলেন। নারী সমাজকে যথার্থ সামাজিক সম্মান দেবার চেষ্টা করেছেন। নারী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া নারী মুক্তি আন্দোলনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষার জন্য লড়াই করেছেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতঙ্গিনী হাজরা, বীণা দাস, প্রীতলতা লড়াই করেছেন। যে নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রাণপাত করেছেন অথচ এই নারী যুগে যুগে অবহেলিত হয়েছে অত্যাচারিত হয়েছে। সমাজ কাঠামো এবং তাকে সম্পদের বেশি কিছু ভাবা হয়নি। নারীর অধিকারকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। নারীর মানবিকতাকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প মহামায়ার মধ্যে দিয়ে সেই মর্মান্তিক ছবিই ফুটে উঠেছে যা তৎকালীন সমাজের একটি করুণ ইতিহাস।

গল্পের চরিত্র মহামায়ার ব্যক্তিত্বের কঠিন রূপ ধরা পড়েছিল। সে জীবনে তাঁর ভালবাসার মানুষের সাথে বিয়ে না করে ঘোমটার আড়ালে জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু যখনি তাঁর পোড়া মুখ রাজীব দেখে ফেলেছে তখনই সে রাজীবের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সে নিজের সংকল্প রক্ষায় অটল থেকেছে। কৌলীন্য প্রথা তাঁর জীবনে ডেকে এনেছে বীভৎসতা। তাঁর অসন্তোষ ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে যখন চিতা থেকে উঠে এসে অব্রাহ্মণ ছেলে রাজীবের ঘরে এসেছে। রাজীবের বিয়ের প্রস্তাবে না করে দেওয়া এবং আবার রাজীব তোমার ঘরেই যাইব বলার মধ্যে একটা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দের প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়। মহামায়ার প্রতি রাজীবের অসম্ভব ভালবাসা ছিল কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা সেখানে প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। সেই প্রাচীরের একদিকে মহামায়া ও অপর দিকে রাজীবের বিভাজিত দাম্পত্য জীবন।

---

[i] গোরাচাঁদ মিত্র, সতীদাহ, শঙ্খ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭১ (বঙ্গব্দ),পৃ-১

[ii] অতীত ও ঐতিহ্য, অষ্টম শ্রেণী, পশ্চিম বঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০১৩, পৃ-৭৯

[iii] স্বপন বসু, সতী, পুস্তক বিপণি, তৃ- সংস্কারণ, কলকাতা, ২০২০, পৃ-১৯

[iv] গোরাচাঁদ মিত্র, সতীদাহ, শঙ্খ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭১ (বঙ্গব্দ),পৃ-৩

[v] https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE?tableofcontents=0

[vi] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পাঞ্চজন্য, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১২৫-১৩০

[vii] সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের দেরশো বছর(১৭০৭-১৮৫৭), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম প্রকাশ-২০০৭-০৮, পৃ-৪০৫